তদ্বির

মহিলাটিকে দেখে সেল্‌স্‌ গার্ল-টার্ল বলেই ধরে নিয়েছিল ওরা। প্রতিবেশী মিসেস ব্যানার্জীর ড্রয়িংরুমে জোর আড্ডা বসেছে। অনিমাদের গেট ও বাড়ির সামনের অংশটা দেখা যায় সেখান থেকে। মিসেস ব্যানার্জীই প্রথমে দেখলেন ওকে। দেখলেন, মহিলাটি গেট খুলে গট্‌গট্‌ করে বারান্দায় উঠে কলিংবেলের বোতাম টিপছে।

ঘরের বাইরে গলা বাড়িয়ে মিসেস ব্যানার্জী তার উদ্দেশে বললেন, "বাড়িতে কেউ নেই। মিসেস সরকার এখানে।"

মেয়েটি ঘাড় শক্ত করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলো, চোখে-মুখে ক্ষমাশীল ধৈর্যের হালকা প্রলেপ লাগিয়ে। অগত্যা উঠতে হল অনিমাকে।

মিসেস ব্যানার্জী নীচু গলায় বললেন, "নিশ্চয় কিছু গছাতে এসেছে, সহজে ছাড়বে না। আপনি বরং এখান থেকেই কথা বলুন।"

দুটো বাড়ির মাঝখানে নীচু পাঁচিল। অনিমা পাঁচিলের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মেয়েটির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলো। রোগা, কালো রঙ। বয়স পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। রোগা বললে ঠিক বলা হয় না - এ যেন একখানা লাঠিকে শাড়ি পরানো হয়েছে। বুক-পিঠ, কোমর-নিতম্ব, এতটুকু উনিশ-বিশ নেই কোথাও। নারীসুলভ কোমলতার ছিটে-ফোঁটা নেই কোনখানে। চকিতে অনিমার মনে পড়ে গেল গত সপ্তাহের ম্যাগাজিনে হার্ম্যাফ্রোডাইটদের বিষয় প্রবন্ধটার সঙ্গে ছাপা একটা ফটোর কথা। এ যেন তাদেরই কেউ ফটো থেকে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে।

জোর করে অরুচিকর চিন্তাটা সরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কি চাই আপনার?"

মেয়েটি শান্ত গলায় বললো, "ডক্টর সবিতা সাহা আমায় পাঠিয়েছেন আপনার কাছে।"

অনিমা অবাক হল। সবিতা তার ছাত্রজীবনের বন্ধু, এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়। সে এমন উদ্ভট চেহারার স্ত্রীলোকটিকে হঠাৎ তার কাছে পাঠাতে যাবে কেন? কই, দিন পাঁচেক আগে যখন এসেছিল সবিতা তখন তো এ বিষয়ে কিছু বলেনি !

তিন বছর আগে ব্যাঙ্গালোরে থাকাকালীন একটা ঘটনা মনে পড়লো। ওদের পরিচিত মিসেস কৃষ্ণমূর্তির বাড়িতে এক আগন্তুকের আবির্ভাব হয়েছিল। সে নাকি ওঁর ভাসুরের খুড়তুতো শালা, কার্যোপলক্ষে এসেছে। তাকে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে কুটুম্বের উপযুক্ত সৎকারের ব্যবস্থায় লেগে গেলেন ভদ্রমহিলা। খানিকবাদে কফির ট্রে হাতে ঘরে ঢুকে দেখেন অতিথি হাওয়া হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে বহু ছোটখাটো মূল্যবান জিনিসপত্র। কি জানি এও সেই রকম কিছু কিনা?

একটা চাপা উদ্বেগ নিয়ে ড্রয়িংরুমের দরজা খুলে চেয়ার দেখিয়ে বললো, "বসুন।"

মেয়েটি ক্ষিপ্রহাতে ব্যাগ খুলে একটা চিঠি বার করে ওর হাতে দিয়ে বললো, "ডক্টর সাহা দিয়েছেন।"

ছোট্ট চিঠি। তার মর্ম এই :- পত্রবাহিকা মীরা হাজারিকা ইন্‌স্টিটিউট্ অফ ----'এ একটা চাকরির জন্য এ্যাপ্লাই করেছে। ইন্‌স্টিটিউটের চেয়ারম্যান ডক্টর রানী যোশীর সঙ্গে অনিমার বহুদিনের ঘনিষ্ঠতা। তাঁর কাছে একটা চিঠি লিখে দিক অনিমা, যাতে চাকরিটা এই মীরা হাজারিকাই পায়। ভদ্রমহিলার পারিবারিক বিপর্যয়ের উল্লেখও রয়েছে চিঠিতে।

চিঠি পড়ে থ' হয়ে গেল অনিমা। দীর্ঘ বিশ বছরের পরিচয় ও বন্ধুত্বের পর আজ হঠাৎ সবিতার বুদ্ধি-বিবেচনার উপর আস্থা হারাতে বসলো সে।

নিশ্চিন্ত ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে বসে আছে মেয়েটি। চিঠিখানা বার-কয়েক নাড়াচাড়া করে মুখ তুললো অনিমা।

"দেখুন, এ কথা ঠিক যে রানীদি আমার নিজের দিদির মত। এককালে খুবই যাওয়া আসা ছিল। কিন্তু গত ক'বছর ধরে আমি কন্ট্যাক্ট রাখিনি। আসলে সংসারের ঝামেলায় সময় পাই না মোটে। উনি যে কেমন আছেন-টাছেন সে বিষয়ে কোন খবরই রাখি না। হঠাৎ এভাবে একখানা চিঠি লিখতে ----" আমতা আমতা করে অনিমা।

মেয়েটি সপ্রতিভ গলায় বলে, "ভালই তো ! আমার চাকরিটার সূত্র ধরে আবার রিনিউ করবেন আপনাদের কন্ট্যাক্ট।

মনে মনে বিরক্ত হলেও ভদ্রতার সুরে বলে অনিমা, "আমি বরং আজকালের মধ্যে একবার নিজে গিয়ে দেখা করার চেষ্টা করবো। ওঁকে ব্যাপারটা এক্সপ্লেন করতে পারবো তা হলে। সেটাই বেশী ভাল নয় কি?"

অনিমা কোনমতে কাটান দিতে চায়।

মেয়েটি একমুখ হেসে সায় দিলো, "সে তো নিশ্চয়ই। আপনার চিঠিটা নিয়ে আমি এখন গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করি, আপনিও সময় করে ওঁর কাছে ঘুরে আসুন একবার।"

অর্থাৎ চিঠিটা লিখতেই হবে। আর অযথা সময় নষ্ট না করে প্যাডটা টেনে নিলো অনিমা।

কি যে লেখা উচিত ভেবে ঠিক করতে পারে না সে। ওর মনে হয় যেভাবেই লিখুক, লেখার মারপ্যাঁচে এই উটকো চিঠির অসংলগ্নতা চাপা দেওয়া যাবে না কিছুতেই। খস্‌খ্‌স করে ক'লাইন লিখে সেটাকে পড়লো। লিখেছে -

"পূজনীয়া রানীদি, আমার বন্ধু সবিতাকে (ডক্টর সবিতা সাহা, ইউনিভার্সিটির ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের রিডার) আপনি বোধ হয় চেনেন। সে-ই মিসেস মীরা হাজারিকাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে। ভদ্রমহিলা একটা চাকরির জন্যে চেষ্টা করছেন। ক'বছর আগে উনি স্বামীকে হারিয়েছেন। সংসারে একটি ছোট ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। চাকরিটা পেলে উনি বেঁচে যান।"

চিঠিটা মোটেই মনঃপূত হল না। বড্ড বোকা-বোকা, মেলোড্রামাটিক মনে হল তার। মীরা হাজারিকা চিঠিটা নেবার জন্যে একটা হাত এগিয়ে রেখেছিল। অনিমা সেদিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি একটা খাম তুলে নিয়ে

তার মধ্যে ভাঁজ করা চিঠিটা পুরে ফেললো। ক্ষিপ্রহাতে সাঁটলো খামটা, তারপর এগিয়ে দিলো তার দিকে।

খামটা ব্যাগে পুরে উঠে দাঁড়ালো মিসেস হাজারিকা, "অনেক ধন্যবাদ। আপনার সময় নষ্ট করলাম বলে কিছু মনে করবেন না। আচ্ছা আসি তবে ----।"

গেট খুলে ক্ষিপ্রপায়ে বেরিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল রাস্তার বাঁকে।

দরজা বন্ধ করে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে এই ঘটনাটাই আদ্যোপান্ত ভাবতে বসলো অনিমা। প্রথমে একচোট রাগ হল সবিতা ও তার আক্কেলের উপর। অনিমাকে ভাবে কি সে? কোন মিনিস্টার না এম.পি.? সাধারণ একজন গৃহিণী ছাড়া কিছু নয়, তার সুপারিশে যদি চাকরি মিলতো তবে সব আগে নিজের জন্যেই সুপারিশ করতো সে। না হয় রিসার্চ ডিগ্রীটা নেই, কিন্তু বিয়ের আগে সেও তো লেকচারার ছিল ক'বছর।

ওর চিঠিটা পেয়ে রানীদি কি ভাববেন সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও খানিকটা আন্দাজ করেই দারুণ অস্বস্তি হতে থাকে তার। দীর্ঘ দশ বছরের নিষ্ক্রিয়তায় সম্পর্কের সূত্র ক্ষীণ হতে হতে কবে ছিঁড়ে গেছে। দায়ী অনিমা। রানীদি অনেক বড়, অনেক ব্যস্ত। তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় শত শত পুরনো ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে যেচে যোগাযোগ রাখা। তবে যখনই তাঁর কাছে যায় কেউ, তাঁর স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে জানিয়ে দেন যে শতের মধ্যে এক হলেও তাঁর বিশাল হৃদয়ে অক্ষুণ্ন আছে তার স্থান।

তবু অনিমা কিছুতেই সহজ হতে পারে না তাঁর কাছে। রানীদির ওর সম্বন্ধে কি ধারণা বুঝতে পারে না সে, সঙ্কোচে আকুল হয়। উনি কি ওকে একটা বোকা, দায়িত্বজ্ঞানহীন মেয়ে ভাবেন, যে নাকি জীবনের সেরা সুযোগটি মাটি করলো স্রেফ্ নিজের নির্বুদ্ধিতার ফলে? হার্বার্ডে রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়ে থিসিস লেখার বদলে গোটা-দশেক প্রেম করে নার্ভাস ব্রেকডাউন করে বসলো শেষে। গোটা-দশেকই বটে। এতদিন পরেও সে কথা ভেবে ম্লান হাসির ছোঁয়া লাগলো অনিমার ঠোঁটে। দশ মানে তো একের পর শূন্য। তার জীবনেও তাই ঘটলো। প্রথমে এক, তারপর শুধু

শূন্য। জীবনভোর বয়ে চলতে হবে এই শূন্যতার বোঝা।

বেচারী রানীদির খুব ঝক্কি গেছে ভূতপূর্ব ছাত্রীর আক্কেলহীনতার জন্যে, কারণ তাঁর দুর্ভাগ্য ও অনিমার সৌভাগ্যবশত রানীদিও তখন হার্বার্ডে। কিংবা রানীদি হয়তো অনিমাকে মোটেও অমন ভাবেন না। কারণ এর ক'বছর পরেই কি অনিমা তার বুদ্ধির পরিচয় দেয়নি? জাত-কুল-শীল বজায় রেখে সচ্চরিত্র, মোটা মাইনের সরকারী চাকুরেকে বিয়ে করে সচ্ছল সংসারের সম্রাজ্ঞী হয়ে বসেনি কি শুধুমাত্র প্রেমের জাদুমন্ত্রে?

কিন্তু সে-কথাটা আসল নয়। চিঠিটা পেয়ে কি ভাববেন উনি? অনিমার স্পর্ধা দেখে অবাক হবেন, কিংবা করুণার হাসি হাসবেন তার নির্বুদ্ধিতায়, কিংবা - হঠাৎ আর একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে চমকে উঠলো সে। ব্যাঙ্গালোরের ঘটনা এটাও। ওর স্বামী দেবেশের অফিসে কয়েকটা পোস্ট খালি হয়েছিল। সিলেক্‌শন্ বোর্ডে ছিল দেবেশ। বিকেলে সে বাড়ি ফিরলেই নানা লোকের আনা-গোনা শুরু হত। সবার মুখেই কোন না কোন করুণ কাহিনী - যেন যোগ্যতা বিচারের সেটাই মাপকাঠি। দেবেশ দারুণ বিরক্ত হত, তবু স্বভাববশে ভদ্র ব্যবহারেই বিদায় করতো ওদের। একদিন ওরা যাওয়ার পর নিজের মনে অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো, "ফুল্‌স্ !"

"কি হল?" শুধোলো অনিমা।

"বোকাগুলো নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ করছে। চাকরির জন্যে তদ্বির ধরাধরি করছে যারা, তাদের নামগুলো কন্‌সিডারও করা হবে না। বেমালুম বাদ পড়বে। বাকী যে ক'জন তদ্বির করেনি, তাদের মধ্যে থেকেই সিলেকশন্ হবে।"

রানীদিও কি তাই করবেন? না, না, তা যেন না হয়। মীরা হাজারিকার চেহারাটা মনে আনার চেষ্টা করলো। কি রুক্ষ, কর্কশ, কঠোর চেহারা ! কে জানে, আগে হয়তো অন্যরকম ছিল। শ্যামল আভা ঘেরা শান্ত লাজুক বধূ ছিল হয়তো, যার চোখের তারায় খেলতো স্বপ্নের ঝিকিমিকি। বেঁচে থাকার সংগ্রামে ক্রমাগত হারতে হারতে এই ধাপে এসে পৌঁছেছে আজ।

রানীদিকে লেখা চিঠিটা মনে পড়লো, "চাকরিটা পেলে উনি বেঁচে

যান।"

রানীদি কি এই লাইনটার গূঢ় অর্থ ধরতে পারবেন? চাকরিটা পেলে বেঁচে যাবে মীরা হাজারিকা। তা না হলে কোথায় তলিয়ে যাবে, তার ছোট্ট ছেলেটার হাত ধরে সেই সব অসংখ্য মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাবে যাদের বাঁচা হল না।

কিন্তু - অনিমার চিন্তাধারা আবার অন্যপথে ঘুরলো। মেয়েটি খুবই বিপন্ন সন্দেহ নেই। আজকের দিনে সংসার চালাতে নিয়মিত বাঁধা আয় সত্বেও হিমশিম খাচ্ছে লোকে। একটি ছোট শিশু নিয়ে সহায়-সম্বলহীন মেয়েটি যে অকূলে পড়বে সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু তবু রানীদিকে লেখা চিঠিটার অসংলগ্নতাটুকু খচ্‌খচ্‌ করতে থাকে। এ যেন হঠাৎ পথে এক কপর্দকহীন, দুঃস্থ লোকের দুঃখে আকুল হয়ে তার হাতে স্টেট্‌ ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারকে চিঠি পাঠালো কেউ, "পত্রবাহকের টাকার ভীষণ প্রয়োজন। অবিলম্বে একে হাজার দশেক টাকা দেওয়া হোক।" রানীদির চোখে আজ অনিমার স্থান কোথায় সে প্রশ্ন বাদ দিয়েও, এখানে প্রধান কথা হল যে চাকরিটা অনিমা বা রানীদির কারোরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। আশ্চর্য, এই সাধারণ কথাটা সবিতার মাথায় আসেনি।

কিন্তু এখন আর এসব ভেবে লাভ? চিঠিটা মীরা হাজারিকার কাছ থেকে ফেরৎ পাওয়া সম্ভব নয় আর। অনিমা কি একবার রানীদির সঙ্গে দেখা করে কৈফিয়ত দিয়ে আসবে? নাঃ, আরও বিচ্ছিরি দাঁড়াবে ব্যাপারটা, আরও বেশী নাটকীয়। একমাত্র আরামদায়ক চিন্তা এই যে ওঁর অগুনতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হয়তো অনেকেই মাঝে মাঝে এমন তদ্বির পেশ করে থাকে ওঁর কাছে এবং ক্রমশ এসব "প্রুফ" হয়ে গেছেন উনি ----।

আড়ামোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালো অনিমা। দেবেশ অফিসের কাজে জামনগর গেছে, ছেলেমেয়েরা বড়দিনের ছুটি কাটাচ্ছে কোলকাতায় তাদের দাদু-দিদার সঙ্গে। কোনও কাজ নেই, অফুরন্ত সময় অনিমার।

আট-দশ দিন পরের কথা। সেদিন সোমবার। দেবেশ আজ রাত্রের ট্রেনে ফিরবে জামনগর থেকে। ছেলেমেয়েদের স্কুলের বাসে তুলে দিয়ে

গ্যারাজ থেকে গাড়িটা বার করলো অনিমা। আই.এন.এ. মার্কেট থেকে কিছু ভাল মাছ কিনে আনবে। আর কিছু সবজি ও ফল। আকাশে মেঘ জমে রয়েছে, প্রচণ্ড শীত। ওভারকোটটা পরে নিলো অনিমা।

বাজারঘাট সেরে ঘড়ি দেখলো, মাত্র সাড়ে এগারোটা। ছেলেমেয়েরা ফিরবে চারটের পর, এক্ষুনি বাড়ি গিয়ে রান্নাবান্না শুরু করার তাড়া নেই। ভাবলো মিসেস কাপুরের সঙ্গে একটু দেখা করে যাবে। অনেকদিন যাওয়া হয়নি। অবশ্য রাস্তায় পড়ে না ওদের বাড়ি - আবার চাণক্যপুরী অবধি যেতে হবে। তবু বেরিয়েছে যখন, সেরেই নেওয়া যাক সেটা। বাড়ি থেকে বেরুনোটাই হয়ে উঠতে চায় না।

প্রায় কুড়ি মিনিট ড্রাইভ করে কাপুরদের বাড়ি পৌঁছে শুনলো, "মেমসাব বাড়ি নেই। ডেন্টিস্টের কাছে দাঁত তোলাতে গেছে।"

কতক্ষণে আসবে সে কথা ওদের ছোকরা চাকরটা বলতে পারলো না, তবে অনিমা আন্দাজ করলো যে আরও ঘন্টাখানেকের মধ্যে ফিরবে না ও। অতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে না অনিমা। তাছাড়া সারারাত দাঁতের ব্যথায় ছট্‌ফট্‌ করেছে যে মানুষটা, দাঁত তুলে সঙ্গে সঙ্গে আড্ডা দেবার মত মেজাজ বা অবস্থায় হয়তো থাকবে না সে। ছোকরাটার হাতে নিজের কার্ডখানা দিয়ে গাড়ি স্টার্ট করলো। বেরোনোর আগে যদি একবার ফোন করতো তাহলে ফোনেই জানা যেতো খবরটা, মিথ্যে এতদূর আসতে হত না সময় ও পেট্রোল ধ্বংস করে।

বৃষ্টি শুরু হল। বর্ষাকালের মত ঝম্‌ঝম্‌ করে নয়। তবে বর্ষার বৃষ্টির ভার না থাকুক, ধার আছে এ বৃষ্টির। মুহূর্তে রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গেল। এই ঠাণ্ডায় জলে ভিজে নিমুনিয়া বাধাতে রাজী নয় কেউ। সাবধানে টার্ন নিয়ে বি.এ্যাভিনিউ'এ ঢুকলো অনিমা। সরোজিনী নগরের মোড়ে স্যুটপরা একটি ছোকরা একহাতে ব্রিফকেসটা বুকে চেপে অন্য হাতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে, অর্থাৎ লিফ্‌ট্‌ চাই। হালকা নীল স্যুট জলে ভিজে জায়গায় জায়গায় গাঢ় নীলের ছোপ - যেন হোলি খেলে এসেছে এইমাত্র। বেচারার আহ্বান উপেক্ষা করে গাড়িগুলো এক এক করে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। অনিমার গাড়িটা সামনে আসতেই ছেলেটি হাত নামিয়ে নিলো। অস্ফুট একটা স্বগতোক্তি করলো অনিমা। শীতে-জলে এই কাহিল অবস্থার মধ্যেও মহিলা চালকের কাছে লিফ্‌ট্‌ চায় না - এটা শিভ্যাল্‌রি না শুচিবাই, না আকাট মূর্খামি - কোন পর্যায়ে ফেলবে ঠিক

করে উঠতে পারে না।

ব্রেক কষে গাড়ি থামালো।

গাড়ির দরজা খুলে মুখে-চোখে বরফ জমানো দূরত্ব ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কোন্ দিকে যাবেন আপনি?"

ছেলেটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে ওর দিকে চাইলো। পরক্ষণে পরিচয়ের আলো খেলে গেলো দু'জোড়া চোখে।

"অনিমাদি, আপনি !"

"আরে সাবু - তুমি !"

ছেলেটি সন্তর্পণে অনিমার পাশে এসে বসলো। হাত বাড়িয়ে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে অনিমা গাড়ি ছুটিয়ে দিলো।

পৃথিবীটা সত্যিই বড় অপরিসর। পথে-ঘাটে, বহু বছর আগে পিছনে ফেলে আসা লোকজনের সঙ্গে হঠাৎ ঠোকাঠুকি হয়ে যায় অপ্রত্যাশিত ভাবে। পাটনায় হোস্টেলে থাকতে গীতুদের বাড়ি মাঝে মাঝে যেতো সে। গীতুর ভাই সাবু তখন স্কুলে পড়ে, বোধহয় ক্লাস ফাইভে কি সিক্সে। গীতুর সঙ্গে অনিমার এমন কিছু হলায়-গলায় ভাব ছিল না। তবে এক ক্লাসে পড়ে, বাঙালী - এইসব সূত্র ধরে খানিকটা আন্তরিকতা গড়ে উঠেছিল। বাড়ি ছেড়ে হোস্টেলে পড়ে থাকা বাঙালী মেয়ে ক'টিকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন গীতুর মা। প্রায়ই কোন-না কোন উপলক্ষে নেমন্তন্ন করে ভালমন্দ রেঁধে খাওয়াতেন। মাঝে মাঝে গীতুর সঙ্গে স্টেনলেস্ স্টিলের ডিবেয় করে পাঠিয়ে দিতেন মাছঝাল, কি পোস্তচচ্চড়ি।

অনিমা খুব বেশি অন্তরঙ্গ হতে পারেনি কোনদিন। মফঃস্বলের নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে সে। গীতুর বাবা পাটনার নামকরা উকিল। ওদের বাড়ির গেটে উর্দিপরা দারোয়ান। বিরাট বাড়িতে অগুনতি ঘর, মোজেইক করা ঝকঝকে মেঝে। বসবার ঘরে পুরু কার্পেট, গদি আঁটা সোফা ও ডিভানে নানা আকৃতির ও নানারকম কারুকার্য করা কুশনের সারি। ওর কেমন যেন আড়ষ্ট লাগতো। গীতুর বাবা-মার স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে সে আড়ষ্টতা খানিকটা কমলেও একেবারে যায়নি। মনে মনে কতকগুলো অলিখিত নিয়ম মেনে চলতো সে। অযাচিতভাবে কখনো

যায়নি ওদের বাড়ি। তাছাড়া পরোক্ষে ওদের আতিথেয়তার শোধ দিতে চেষ্টা করেছে মাঝে মাঝে গীতুকে আইসক্রীম খাইয়ে এবং হোস্টেলে বিশেষ বিশেষ ভোজের দিন ওকে তার গেস্ট হিসেবে নেমন্তন্ন করে।

অবশ্য এসব হিসেব নিকেশের ধার ধারতো না গীতু।

প্রায়ই নিজে থেকে উপর-পড়া হয়ে বলতো, "এই, তোদের হোস্টেলে রবিবার দিন খাবো আমি। মাকে ফোন করে বলিস, প্লীজ।"

কোনদিন অনিমা ফোন করতো, কোনদিন মীরা, কোনদিন ঝর্ণা কিংবা মঞ্জু। ওদের ঝকঝকে ফোর্ডখানা সকালবেলা হোস্টেলের সামনে এসে দাঁড়াতো। একমুখ হাসি নিয়ে নামতো গীতু।

স্টিলের ডিবেটা বন্ধুদের হাতে দিতে দিতে ড্রাইভার লাল সিংকে বলতো, "ঠিক পাঁচ বাজে আয়েগা, সমঝা?"

লাল সিং গাড়ি নিয়ে চলে যাবার পরই উসখুস করতো গীতু, "এই শোন্, আমার একটা কাজ আছে পাটনা মার্কেটে। একটু ঘুরে আসি, বুঝলি?"

একটা রিক্শা ডেকে উঠে বসতো। ফিরতো দুপুর পার করে। অনিমা মনে মনে একটা কিছু আন্দাজ করেছিল, তবে সঙ্কোচে জিজ্ঞেস করেনি কোনদিন। সেদিন গীতু যাওয়ার পর বাকী ক'জনের চাপা গলার আলোচনা কানে এলো।

ঝর্ণা খুব উত্তেজিত হয়ে বলছে, "জানিস, গীতুর একজন লাভার আছে। ও বলেছে, তার নাম ও কাউকে বলবে না। ওর পেটে ছুরি মারলেও না।"

মঞ্জু ও মীরা সাগ্রহে আলোচনায় যোগ দিলো। অনিমার মনেও কৌতুহলের অভাব ছিল না, কিন্তু মফঃস্বলের লজ্জায় চাপা পড়ে গেল সেটা।

অবশ্য নামটা চাপা রইলো না বেশিদিন। শুধু ওরা ক'জনই নয়, সারা পাটনা শহর জানলো। সেই লাভারই গীতুর পেটে ছুরি মারলো, যদিও রূপক অর্থে। অনেকদিন ধরে কলেজে আসছে না গীতু। এরা চারজন খবর নেবে নেবে করেও শেষ অবধি ওর বাড়ি গিয়ে উঠতে

পারেনি। বোধহয় উকিল বাড়ির ঠাটবাটে মনে মনে চারটে মেয়েই সমান সঙ্কুচিত হত। যা হোক্, খবর আনলো ডে-স্কলার সুচেতা।

টিফিনে ওদের একপাশে ডেকে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে গলা নামিয়ে বললো, "এই শোন্ গীতু কি কেলেঙ্কারী করেছে ! ওর নাকি বাচ্চা হবে এবং সেই লাভার-চন্দর আর কেউ নয়, ওর গানের মাস্টার।"

"ধ্যেৎ !" ওরা অবিশ্বাসের হাসি হাসে।

গীতুর গানের মাস্টারকে অনেকবার দেখেছে ওরা। মাঝবয়সী, মর্কটমার্কা বুনো চেহারা। তার পাশে লাল সিংকেও অনেক বেশী মাজা-ঘষা স্মার্ট মনে হয়।

সুচেতার আনা খবর যে মিথ্যে নয়, তা প্রমাণ হয়ে গেল কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই। সেই শুঁটকো, কালো, মুকুন্দ পাসোয়ানের সঙ্গেই বিয়ে হয়ে গেল গীতুর। অনিমারা বিয়েতে যায়নি, ওদের নেমন্তন্ন করেনি। করলেও যাওয়ার সাহস হত কিনা সন্দেহ। প্রতি রবিবার হোস্টেল থেকে রিক্শায় চেপে কোন জরুরী কাজে যেতো গীতু, সে রহস্য বুঝতে বাকী নেই কারো। কাজেই গীতুর এই অধঃপতনের জন্যে অন্তত খানিকটা দায়িত্ব তাদেরও বর্তায়, ব্যাপারটা তাদের অজ্ঞাতসারে হলেও।

অবশ্য বিয়েতে না গিয়ে লোকসান হয়নি কিছু। সুচেতার কাছে সব খবরই পেয়েছে। গীতুদের প্রতিবেশী ওরা, বন্ধুও। সুচেতার কাছেই শুনলো, বিয়েবাড়ি নাকি শ্রাদ্ধবাড়ির চেয়েও শোকাচ্ছন্ন ছিল সেদিন। গীতুর মা বারবার ফিট্ হচ্ছিলেন। ওর বাবাকে কেউ দেখতে পায়নি। উনি নাকি ছাদের ঘরে খিল দিয়ে বসেছিলেন। জ্ঞাতি-বন্ধুরাই কন্যাদান ইত্যাদি করেছে কোনরকমে দায়সারা করে। গীতুকে দেখে মনে হচ্ছিল, প্রেমের ভূত ঘাড় থেকে নেমে গেছে ইতিমধ্যেই। দু'চোখ জবাফুলের মত লাল। বরের দিকে একবারও নাকি তাকায়নি। কুশণ্ডিকার সময় হড়্হড়্ করে বমি করে ফেললো। হ্যাঁ, সাজগোজ করেছিল মুকুন্দ পাসোয়ান। এ বিয়েতে সে যে অখুশি নয়, পানদোক্তার ছোপধরা দু'পাটি দাঁত বার করে জাহির করছিল অবিরত।

"জানিস, কি কদাকার দেখাচ্ছিল লোকটাকে ! ছিঃ ছিঃ, গীতুটা নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছিল।"

আরও জানা গেল, বিয়ের দিন ভোরবেলা নাকি দু'টো রিক্‌শা এসে থেমেছিল গীতুদের প্রকাণ্ড লোহার গেটের সামনে। একটি গ্রাম্য স্ত্রীলোক ঘোমটার আড়ালে ঘন ঘন চোখ মুছছিল। তার কোলে একটা মাস-ছয়েকের বাচ্চা ও সঙ্গে আরও দু'টি ছেলেমেয়ে। ওদের সঙ্গে একটা বুড়োও ছিল। ওরা নাকি যথাক্রমে পাসোয়ানের স্ত্রী, তিনটি সন্তান ও শ্বশুর। দারোয়ান তাদের ভিতরে ঢুকতে দেয়নি। বাইরে দাঁড়িয়ে বুড়োটা খানিক চেঁচামেচি করলো। বউটা খানিক কাঁদলো। তারপর রিক্‌শা করে ফিরে গেল আবার। আশেপাশের লোকেরা ভিড় করে বিনে পয়সায় তামাশা দেখলো খানিকক্ষণ।

এর ক'দিন পর সুচেতার মুখেই ওরা শুনলো যে গীতুর বাবা পাটনার বাস তুলে দিয়ে সপরিবারে অন্য শহরে চলে গেছেন।

এত বছর পর আজ গীতুর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা এমন অদ্ভুতভাবে। অনিমা ভেবে পায় না কি বলবে। গীতুর কথা জিজ্ঞেস করতে কেমন বাধো-বাধো লাগে তার। এত বছর পর আবার সেই মফঃস্বলের জড়তা ঘিরে ধরলো হার্বার্ড ফেরত, অগুনতি কক্‌টেল-ডান্স-ডিনার পার্টি চষে ফেলা, দুঁদে অফিসারের স্ত্রী মিসেস অনিমা সরকারকে। বৃষ্টির মধ্যে তীরবেগে এগিয়ে চলে গাড়ি। সাবু নড়েচড়ে বসে। অনিমা সামনে রাস্তার দিকে নজর রেখে গলায় আটপৌরে ভাব ফুটিয়ে দু'চারটে মামুলী প্রশ্ন করে। সাবুর বাবা-মা এখানেই আছেন, নওরোজীনগরে। ওর ছোট বোন শ্যামলী এবার বি.এ. পরীক্ষা দেবে। গীতু কোলকাতায় একটি আশ্রমে টিচার। ওর মেয়েটাও ওখানেই আছে। সাবুর চোয়ালটা হঠাৎ কেমন শক্ত হয়ে উঠলো, আড়চোখে দেখতে পেলো অনিমা। গীতু আশ্রমে কেন এবং যে লোকটাকে সে বিয়ে করেছিল সেই বা কোথায়, এ প্রশ্ন দুটো ও করতে গিয়েও করলো না।

নওরোজীনগরে একটা বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামলো। বৃষ্টি ধরে এসেছে। সাবু গাড়ি থেকে নেমে একটু ইতস্তত করছিল।

অনিমা এ পাশের দরজা খুলে নেমে পড়লো, "চলো, মাসীমা, মেসোমশায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।"

ছোট্ট নীচু ঘর। একটা চৌকি ও খান দুই চেয়ারেই যেন ঠাসা হয়ে

আছে। চৌকিতে শুয়ে আছেন গীতুর বাবা। মাসীমা মাটিতে বসে থালায় চাল বাছছেন। অনিমা কাছে গিয়ে প্রণাম করলো।

সাবু একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললো, "বসুন অনিমাদি।"

ভাসা ভাসা কথাবার্তা হয়। আগেকার সেই আন্তরিকতাটুকু নেই আর, নগ্ন দারিদ্র্যের লজ্জাজনিত অস্বস্তি গৃহস্থ ও অতিথি দু'তরফেরই কন্ঠরোধ করতে চায়। বসু পরিবারের এতগুলো বছরের ইতিহাস ভেবে নিতে এতটুকু অসুবিধা হয় না অনিমার। পাটনা ছাড়ার কিছুদিনের মধ্যেই স্ট্রোক্ হয় গীতুর বাবার। সে যাত্রা প্রাণে বাঁচলেও প্যারালিসিসে পঙ্গু হয়ে মরার বাড়া অবস্থা তাঁর। ব্যাঙ্কে নিশ্চয়ই মোটা রকমের সঞ্চয় ছিল। তাছাড়া পাটনার বাড়িটা তাড়াহুড়োতে কমদামে বিক্রি করলেও সেই কমদামের অঙ্কও কম নয়। কিন্তু ভাঙতে ভাঙতে সঞ্চয়ের পুঁজি নিঃশেষ হয়ে এসেছে একদিন। হাল-মাস্তুলবিহীন সংসার-তরণীটি ভাসিয়ে রাখতে যে কি পরিমাণ সংঘর্ষ করতে হয়েছে ও হচ্ছে, তার ছবি এ বাড়ির প্রতিটি প্রাণীর চোখ-মুখে আঁকা।

সাবু পাশের ঘর থেকে স্যুট ছেড়ে শার্ট-পাজামা পরে এলো। শ্যামলী চা ও চিঁড়ে ভাজা নিয়ে অনিমার সামনে দাঁড়ালো। ওর হাত থেকে চায়ের কাপ নিতে গিয়ে ওর তালিমারা ফুলহাত সোয়েটারের কনুইয়ের দিকে অনিমার দৃষ্টি চলে যায় বারে বারে। মনে মনে নিজেকে ধমক দিয়ে, মুখে হাসি টেনে এনে সাবুর দিকে নজর ফেরায় অনিমা।

বিফলতার আরও কিছু অপ্রিয় কাহিনী শোনার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে লঘুকন্ঠে জিজ্ঞেস করে, "তারপর, তুমি এখন কি করছো?"

না, ভুল ভেবেছিল অনিমা। ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস ফেলে না ওরা। মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সব ক'টি মুখ। কঠোর দারিদ্র্যের ক্ষরণে নির্জীব মুমূর্ষু মানুষগুলোর চোখে সঞ্জীবনীর প্রতিশ্রুতি ভেসে ওঠে। সাবু। হ্যাঁ, সাবুই বাঁচাবে গোটা সংসারটাকে। এতগুলো পারিবারিক দুর্বিপাক, দুর্ঘটনা মিলেও নিঃশেষ করতে পারেনি তার প্রতিভা ও উচ্চাশাকে। এত কষ্টের মধ্যেও পড়াশোনা চালিয়ে গেছে। ধাপে ধাপে প্রতিটি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছে সর্বোচ্চ সম্মান পেয়ে। গত ক'বছর বড় বেশি টানাটানি পড়েছিল।

এম.এ. পাস করে দিল্লীর উপকন্ঠে একটা ছোট কলেজে চাকরি নিয়েছিল সাবু, সেই সঙ্গে চালিয়ে গেছে রিসার্চ। হয়তো বিদেশ যাওয়ার জন্যে একটা বৃত্তি জোটাতে পারতো, কিন্তু ওর মাইনের টাকা ক'টা একমাত্র সম্বল ওদের, কাজেই বিদেশ যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না তার। কিছুদিন আগে দিল্লী ইউনিভার্সিটি থেকে পি.এইচ্.ডি. পেয়েছে। একটা ভাল চাকরির জন্যে এ্যাপ্লাই করেছিল; আজ ইন্টারভিউ দিয়ে এসেছে। যোগ্যতম প্রার্থী ও-ই ছিল; কাজেই চাকরিটা ও-ই বোধহয় পাবে, ইন্টারভিউ বোর্ডও এরকম একটা ভাসা-ভাসা ইঙ্গিত দিয়েছে ওকে।

"মাইনেপত্তর ভাল, ইউ.জি.সি. স্কেল।" সাবুর বাবা বিছানায় শুয়ে শুয়ে পাদপূরণ করেন।

"চাকরিটা কোথায়?"

"ইন্স্টিটিউট্ অফ ---- "

কয়েক মুহূর্তের জন্যে নিঃশ্বাস নিতে ভুলে যায় অনিমা। মনে মনে সেদিনকার ঘটনাটার পুনরাবৃত্তির জন্যে প্রস্তুত করে নিজেকে। পাটনায় থাকতে রানী যোশীই ওর লোকাল গার্জেন ছিলেন। সে খবর এরা খুব ভালভাবেই জানে। অতএব, আর একখানা চিঠি যে লিখতে হবে ওকে, সে বিষয়ে প্রায় নিঃসন্দেহ অনিমা। আশ্চর্য, অস্বস্তির বদলে হঠাৎ ভীষণ হাসি পেয়ে যায় এত বছর পর রানীদির মুখটা মনে করতে গিয়ে। বছর পনেরো আগের একটা ঘটনা মনে পড়ে যায় তার।

১৯৬২ সাল সেটা। বেচারী রানীদি অনিমার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। ওর একটা হিল্লে করবেনই তিনি। বাল্টিমোর্ থেকে সনৎ রায় এসেছিল রানীদির আমন্ত্রণে হার্বার্ডে বেড়াতে। রানীদির প্রাক্তন ছাত্র, অনিমার চেয়ে বছর দু'য়েকের সিনিয়র। রানীদির তত্ত্বাবধানে দু'জনের আলাপ পরিচয় ধাপে ধাপে এগিয়ে চললো। কন্ডাক্টেড্ ট্যুর'এর মত কন্ডাক্টেড্ প্রেম যেন ! সনৎ ফিরে গেল ওদের বাল্টিমোর্ আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে।

মাস তিনেক পর। রানীদিই সাজেস্ট করলেন। অনিমার এত খাটাখাটুনি যাচ্ছে, দিন কয়েক বাল্টিমোরে ছুটি কাটিয়ে আসুক না। সনৎকে একটা চিঠি লিখে দিক, ওর জন্যে ঘর ঠিক করে রাখবে সে।

যথা আজ্ঞা বলে মেনে নিলো অনিমা। কিন্তু কুঁড়ের বাদশা সে। সনৎকে চিঠিটা লিখবে-লিখবে করেও শেষ অবধি লেখা হয়ে উঠলো না। ভাবলো যাকগে, একটা ফোন করে দেবে যাওয়ার আগে।

সকাল দশটায় বাস ছাড়বে, বাড়ি থেকে বেরুবার পূর্ব মুহূর্তে সনতের টেলিফোন নাম্বারটা কিছুতেই খুঁজে পেলো না। চিঠিতে নাম্বারটা লিখে পাঠিয়েছিল, ডায়েরীতে তোলা হয়নি আর। সে চিঠিটাই কোথায় গায়েব হয়ে গেছে। ড্রয়ারগুলো তোলপাড় করে ফেললো অনিমা। কিন্তু কোথায়? অনেক খোঁজা-খুঁজি করে আর একটা চিঠি পেলো। খুলে দেখে, চার্লস্টন্ থেকে সুদর্শন থাপার লিখেছে টেলিফোন নাম্বার ও আমন্ত্রণ জানিয়ে। হাতঘড়িটা দেখলো অনিমা, তারপর চিঠিটা হাতব্যাগে ভরলো। বাস-স্টেশন থেকে সুদর্শনকে ফোন করে টিকিট কেটে অম্লান বদনে চার্লস্টনের বাসে উঠে বসলো সে। সেখান থেকে ফেরার পর রানীদির স্তম্ভিত বাক্যহারা চেহারাটা মনে আঁকা হয়ে আছে আজও। (পর পর দু'জন প্রার্থীর হাতে একই চাকরির সুপারিশ করে চিঠি পাঠালে কি ভাববেন রানীদি? আবার কি সেদিনের মত স্তব্ধ হতবাক্ হয়ে যাবেন অনিমার সীমাহীন কাণ্ডজ্ঞানহীনতায়!)

সেদিন হার্বার্ডে একটা কথা সে কিছুতেই বলতে পারেনি রানীদিকে। তার পৃথিবী থেকে একটি মুখ হারিয়ে যাওয়ার পর, পৃথিবীতে "সে-নয়"দের ভিড়ে কাউকে আলাদা করে চিনে রাখতে পারেনা অনিমা। ওরা যেন সদ্য ট্যাঁকশাল থেকে বেরিয়ে আসা একরাশ চকচকে ঝকঝকে টাকা। ওদের যৌথভাবে প্রশংসা করতে পারে, পছন্দ করতে পারে, এমন কি হয়তো ভালও বাসতে পারে; কিন্তু অতগুলোর ভিড়ে একটিকে বেছে নেবে কেমন করে? কয়েক বছর পর তবে দেবেশকে বেছে নিলো কি করে? এই একটা প্রশ্ন অনিমা কোনদিন করবে না নিজেকে, নিজের মনের কাছে চুক্তিবদ্ধ সে। অর্ফিয়াসের মত পিছনে চেয়ে দেখার ভুল আর সে করবে না। চোখ বুজে মেনে নেবে, "আছে, আছে, আছে" যদিও অন্তর্যামী জানেন, চোখ খুললেই হয়তো দেখবে কোথাও কিছু নেই।

কিন্তু এসব কি ভাবছে সে ! এত বছর পর রানীদি হয়তো ভুলেই গেছেন ওকে, অন্তত ওর দেওয়া মাথাব্যথাগুলো। মুহূর্তে দিবাস্বপ্ন

থেকে মাটিতে ফিরে আসে অনিমা। ওদের কাছে বিদায় জানিয়ে উঠে দাঁড়ায়। না, রানীদির কথা তুললো না ওরা। অনিমা বাইরে এসে জোরে শ্বাস নিলো - হতাশার দীর্ঘশ্বাস নয়, মুক্তির নিঃশ্বাস। গাড়ি স্টার্ট করে জানলা দিয়ে যন্ত্রচালিতের মত হাত নাড়লো বারান্দায় দাঁড়ানো সাবু ও শ্যামলীর উদ্দেশে। খানিক দূরে যেয়ে মনে পড়লো, ফ্ল্যাটের নম্বরটা খেয়াল করেনি ও। সাবুর কলেজের নামটাও জেনে আসেনি। অবশ্য ও দুটো ঠিকানাই এরই মধ্যে মনে মনে বাতিল হয়ে গেছে বসু পরিবারের কাছে। ইন্‌স্টিটিউটের কাছাকাছি একটা ভাল ফ্ল্যাট পেলে উঠে যাবে ওরা, গীতুর বাবা বারকয়েক বলেছেন সে কথা, আর মাসীমা বিদ্বেষভরা চোখে তাকিয়ে থেকেছেন চুন-বালি খসা, এবড়ো-খেবড়ো দেয়ালের দিকে, যেন এই বিচ্ছিরি ঘর দু'খানাই ষড়যন্ত্র করে আটকে রেখেছে ওদের এত বছর ধরে।

(উপসংহার)

দুপুরবেলা কলিংবেল বেজে উঠলো। দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো মীরা হাজারিকা। প্রথমটা চিনতে পারেনি অনিমা। চেনার পরও ওর আনন্দোচ্ছল কোলাহলে কেমন হতবাক হয়ে গেছিল। মীরা হাজারিকার হাতে বড় একটা কাগজের বাক্স - দু'হাতে সেটা ধরে একই সঙ্গে অনিমাকে জড়িয়ে ধরবে, না প্রণাম করবে ঠিক করতে না পেরে দিশেহারা অবস্থা তারও।

"শুদ্ধু আপনার জন্যে সম্ভব হল ! আরও অনেক হাইলি কোয়ালিফায়েড ক্যাণ্ডিডেট্ ছিল। একজন ডক্টর বাসু, তিনি তো শুনলাম অল্ থ্রু ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। রানীদি বললেন আপনার কথা। আপনাকে উনি নিজের বোনের মত স্নেহ করেন। আপনারা যে দিল্লীতে এসেছেন, জানতেন না উনি। বারে বারে বলে দিয়েছেন, একদিন বাচ্চাদের ও আপনার স্বামীকে নিয়ে ওঁদের বাড়ি যেতে।"

অনিমার হতচকিত ভাবটা কাটতে চায়না কিছুতেই। মীরা হাজারিকা মিষ্টির বাক্স খুলে একটা সন্দেশ ওর মুখে তুলে দিতে এলে অনুগত ভাবে মুখটা এগিয়ে দেয় - অন্তত খানিকটা সময় পাওয়া যাবে সুস্থ, স্বাভাবিক হওয়ার।

কিন্তু একি, সন্দেশটা আটার দলার মত ওর গলার কাছে আটকে রইলো কেন?